৪

রাত্রিকে ফেলে রাধিকা চলে যাওয়াতে তার মনটা খারাপ হয়ে গেলো। সে কি করবে বুঝতে পারছিলোনা। হাসপাতালের সামনে ঠাই দাঁড়িয়ে আছে। হাসপাতাল ছুটির পর তুফান প্রতিদিন অপেক্ষা করে সুমির জন্যে হাসপাতালের সামনে। আজ তার আসতে দেরী হচ্ছে। সুমি কিছু দূরেই তুফানের আসার জন্যে অপেক্ষা করছিলো। ছেলেটাকে ঠিক সাড়ে চারটায় আসতে বলেছিলো, অথচ, এখন প্রায় পাঁচটা। তার কোন খবর নেই। রাত্রির হঠাৎই চোখে পরলো সুমিকে। সে তাকে দেখে এইদিকেই এগিয়ে আসার জন্যে উদ্যোগ করলো। ঠিক তখুনিই লাল গাড়ীটা নিয়ে তুফান ঠিক সুমির পাশে এসে থামলো। তুফান আসতেই সুমি বললো, এত দেরী কেনো তোমার?

তুফান বললো, আর বলোনা সুমি, যানজটের যে অবস্হা, তোমাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্যে দুঃখিত। তবে তা আমি তোমাকে পুষিয়ে দেবো। আজকে ইটালীয়ান এক রেষ্টুরেন্টে বুক করে রেখেছি।

সুমি একবার আড় চোখে রাত্রির দিকে তাঁকিয়ে চোখ টিপলো, তারপর গাড়ীতে গিয়ে বসলো।

আহমেদ পুরনো একটা সাইকেল সংগ্রহ করেছে, এই শহরে চলাফেরা করার জন্যে। সে তার কাজ শেষ করে সাইকেলটা চালিয়ে কোথায় যেনো যাচ্ছিলো। রাত্রিকে মন খারাপ করে হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে তার দিকেই এগিয়ে এলো। বললো, আরে রাত্রি, তুমি? ক্ষুধা লাগেনি?

রাত্রি বললো, খুব ক্ষুধা লেগেছে, পেট একেবারে চোঁ চোঁ করছে।

সত্যিই রাত্রির পেটের ভেতর থেকে ক্ষুধার এক বিদঘুটে শব্দ বেড়িয়ে এলো।

আহমেদ বললো, আমারো বেশ ক্ষুধা পেয়েছে, চলো খেতে যাই।

রাত্রি বললো, কোথায়? কোনো হাই ফাই রেষ্টুরেন্টে? ইটালীয়ান? চাইনীজ?

আহমেদ বললো, আরে না, ইটালীয়ান, চাইনীজ। মুসা মিয়ার দোকানে।

রাত্রির মনটা আরো খারাপ হয়ে গেলো। সে বললো, তাহলে আজকে খাবারের বিল তুমি দিবে। ঐদিন তো আমি দিয়েছি।

আহমেদ বললো, নো প্রোবলেম। আজকে তুমি পেট ভরে যত খুশী বিরীয়ানী খেতে চাও খাবে। সব বিল আমি দেবো।

আহমেদের হঠাৎ এই সদয়ের ব্যাপারটা বুঝতে পারলোনা রাত্রি।

আহমেদ আসলে সকালে হাসপাতালে যাবার পথে মুসা মিয়ার দোকানের সামনে বড় পোষ্টারের বিজ্ঞাপণটা দেখে গিয়েছিলো। পেট চুক্তি বিরীয়ানী মাএ বিশ টাকা। শুধু আজকের জন্যে।

মুসা মিয়ার দোকানে ইদানীং বেচা কেনা ভালো যাচ্ছেনা। কাস্টোমার ধরে রাখার জন্যে সে নুতন নুতন অনেক পদ্ধতি বেড় করছে। এটি তার মাঝে একটি।

মুসা মিয়ার দোকানে ঢুকতেই সে বললো, আসেন আসেন, পেট চুক্তি বিরীয়ানী মাত্র বিশ টাকা। মাত্র বিশ টাকা।

রাত্রি বিরীয়ানী খেতে খেতে বললো, ঐ সুমি মেয়েটাকে যদি একটা ভালো শিক্ষা দিতে পারতাম!

আহমেদ খেতে খেতে বললো, সুমি আবার কি করেছে?

রাত্রি বললো, আর বলোনা, মেয়েটার যে কি দেমাগ, তার দেমাগ আমি দেখিয়ে দেবো।

রাত্রি তিন তিনটি বাড়তি বিরীয়ানী ফুস্কা শেষ করে মুসা মিয়াকে বললো, আর এক প্লেট!

রাত্রি তখন ছয় প্লেট বিরীয়ানীর প্রায় অর্ধেক শেষ করেছে, ঠিক তখুনিই মুসা মিয়া ঘড়ি ধরে বলতে লাগলো, দশ, নয়, আট, সাত, ছয়, পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক, হুম সময় শেষ। এবার খাবার বন্ধ করেন।

মুসা মিয়ার উল্টো কাউন্ট করার কোন কারন বুঝতে পারলোনা রাত্রি। কিছু না বুঝেই আপাততঃ উল্টো কাউন্ট শেষ হবার আগেই সে তার প্লেটের খাবার শেষ করলো।

আসলে বিজ্ঞাপণের নীচের দিকে ছোট করে লেখা ছিলো, এক ঘন্টার মধ্যে। এবং এক ঘন্টায় যে সবচেয়ে বেশী প্লেট খেতে পারবে, তার জন্যে রয়েছে বিশেষ পুরস্কার।

আহমেদ আর রাত্রি খাবার শেষ করে বিল দিতে এগিয়ে গেলো। আহমেদ বিশ টাকার দুটো নোট বের করে এগিয়ে দিতেই মুসা মিয়া বললো, বিশ টিয়া।

আহমেদ বললো, কেনো? দুজন খেলাম, চল্লিশ টাকা তো হবার কথা।

মুসা মিয়া বললো, ইয়ান ঠিক, কিন্তু আফায় তো রেকড বাঙি দিছে। তই আঁর শর্ত, এক প্যাকেট বিরীয়ানী ফ্রী দন পরিবো, টিয়া দি ও বদলাইত পারন। বিরীয়ানী ন নিলি, টিয়াও দন পইরতুনো।

রাত্রি লাফিয়ে উঠে বললো, না না বিরীয়ানী নেবো।

মুসা মিয়া বললো, তই ঠিক আছে।

তারপর সে ডাকলো, ঐ রমজান, এক প্যাকেট বিরীয়ানী বালা গরি বাঁদি দে তো আফারে।

তারপর, রাত্রিকে বললো, আফা তই আর একখান কতা আছে, রাইত বারোটার মাইজে অনের রেকড কেই বাঙিত ন পাইরলে, অনের লাই একখান টেলিবিশন আছে। কাইলকে আসি একখান খবর লইয়েন। আর এডে অনর নাম ঠিকানা খান লিখি দন।

মুসা মিয়া কাগজ কলম এগিয়ে দিলো রাত্রিকে।

পেট ভরে খেয়ে মুসা মিয়ার দোকান থেকে বেড়িয়ে রাত্রি বললো, আহ কতদিন পর পেট ভরে বিরীয়ানী খেলাম!

বিরীয়ানীর প্যাকেটটা হাতে নিয়ে হাটছিলো আহমেদ রাত্রির পাশাপাশি। সে প্যাকেটটা রাত্রির দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো, এই নাও তোমার বিরীয়ানী।

রত্রি প্যাকেটটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো বারকয়েক। তারপর, আহমেদের দিকে বাড়িয়ে বললো, নাহ তোমাকে দিয়ে দিলাম। তোমার বেতন হতে তো আরো অনেক দেরী। কালকে রাতে খেতে পারবে।

আহমেদ খুব খুশী হয়ে উঠলো, সে রাত্রির হাতের দিকে তাকিয়ে বললো, আমার খুব পছন্দ!

রাত্রি অবাক হয়ে বললো, মানে?

আহমেদ বললো, না, তোমার হাত। তোমার হাতে কেমন নার্স নার্স একটা ভাব!

রাত্রি রেগে গেলো, কি বলতে চাইছো?

আহমেদ বললো, না না রাগের কি আছে, বললাম যে, তোমার এই হাতের সেবা যদি কখনো পেতাম!

আহমেদ কিছুক্ষন অন্য মনস্ক থেকে, রাত্রির হাত থেকে ছুঁ মেরে বিরীয়ানীর প্যাকেটটা নিয়ে, তার সাইকেলে চরে বসলো। তারপরা বললো, আজকে যাই রাত্রি, গুড নাইট।

সাইকেল চালাতে শুরু করতেই কি মনে হতে আহমেদ বললো, স্যরি তোমাকে কিছুদূর এগিয়ে দিবো নাকি?

রাত্রি কিছুটা বিব্রত হয়ে বললো, নাহ, আমার বাসা এই সামনেই, দরকার নেই।

আহমেদ বললো, তাহলে ঠিক আছে, ভালো থেকো, কালকে আবার দেখা হবে।

আহমেদ তার সাইকেলটা চালিয়ে যেতে যেতে মিলিয়ে গেলো অন্ধকারে। রাত্রি তাকিয়ে রইলো সেদিকে কিছুক্ষণ।

বাসায় ফিরে রাত্রির মনটা কেমন যেনো উদাস হয়ে উঠলো। সে বিছানার পাশে মেঝেতে বসে রোদে শুকানো কাপরগুলো ভাজ করতে যেতেই নিজের হাতের দিকে নজর গেলো। তার কানে আহমেদের কথাগুলো প্রতিধবনিত হয়ে উঠলো, আমার খুব পছন্দ! তোমার হাত। তোমার হাতে কেমন নার্স নার্স একটা ভাব! তোমার এই হাতের সেবা যদি কখনো পেতাম!

সে বারবার নিজের হাতটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো, আর আহমেদের চেহারাটা ভাবতে লাগলো।

রাত্রি রাতে ঘুমুতে গিয়েও, শুয়ে শুয়ে বারাবার নিজের হাতটা দেখতে লাগলো। আর ভাবতে লাগলো, হাসপাতালে ফিরে গিয়ে আহমেদ না জানি কি করছে?

রাতে চমৎকার একটা ঘুম হলো রাত্রির। সকালে ঘর থেকে বেড়িয়ে সে কেমন যেনো উড়তে উড়তে হাসপাতালের পথে রওনা হলো। ঘর থেকে বেড়োতেই চোখে পরলো, বাড়ীওয়ালার বাগানে ফুটে রয়েছে রং বেরংয়ের কসমস ফুল। সে এগিয়ে গেলো সেদিকে।

তার কি মনে হলো কে জানে। সে হলুদ রংয়ের একটা ফুল ছিড়ে নিলো। ঠিক তখুনিই সে পেছন থেকে, বাড়ীওয়ালী রহিমা বেগমের গলা শুনতে পেলো, রাত্রি, রাত্রি, একটু দাঁড়াও।

রাত্রি সাংঘতিক ভয় পেয়ে গেলো। ফুল ছিড়ে আবার কি বিপদেই না পরলো এই সাত সকালে। সে ছেড়া ফুলটা লুকিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো।

বাড়ীওয়ালী একটা ছোট সাইজের মোটা কাগজের বাক্স নিয়ে ছুটতে ছুটতে রাত্রির কাছে এসে দাঁড়ালো। তারপর, ঢাকনিটা খুলে বললো, ভাপা পিঠে, গত রাতে নাতী নাত্নীরা এসেছিলো। তোমার জন্যে কয়েকটা তুলে রেখেছিলাম।

রাত্রি বড় বড় ভাপা পিঠেগুলো দেখে উল্লসিত হয়ে বললো, ভাপা পিঠা!

বাড়ীওয়ালী বললো, হা, তোমার অফিসের সবাইকে নিয়ে খাবা।

রাত্রি ভাপা পিঠার বাক্সটা হাতে নিয়ে বললো, ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি যাই, অফিসের সময় হয়ে গেছে।

বাড়ীওয়ালী বললো, যাও মা। সাবধানে যাবে।

তুফানকে নিয়ে সুমি এক বড় সমস্যায় পরলো। সে গতরাতে তাকে বাসায় পৌঁছে দেবে বলে তাদের বাড়ীটা চিনে নিয়েছে। আর আজ সাত সকালে বাড়ীর সামনে এসে হর্ণ বাজাতে লাগলো। সে বায়না করলো তাকে আজ, তার গাড়ীতে করে হাসপাতালে পৌঁছে দেবে।

তুফানের গাড়ীটা যখন হাসপাতালের গেইট দিয়ে ঢুকছিলো, ঠিক তখন রাত্রি একটা সি এন জি থেকে নেমে হাসপাতালের বাইরের গেইট দিয়ে ঢুকছিলো। রাত্রির একহাতে একটা ফুল আর অন্য হাতে একটা বাক্স নিয়ে এলোমেলো পা ফেলে আপনমনে হেটে চলছিলো। রাত্রির এলোমেলো পথ চলা দেখে, হঠাৎই তুফান গাড়ীতে হর্ণ বাজালো। হঠাৎ হর্ণের শব্দে চমকে উঠলো রাত্রি, আর সাথে সাথে তার হাতের বাক্সটা ছিটকে পরে গেলো। পরলো তো পরলো একেবারে তুফানের গাড়ীর চাকার নীচে।

ব্যাপারটা সুমি কিংবা তুফানের কারো নজরেই পরলোনা। তুফান, হাসপাতালের ভেতরের গেইটের কাছাকাছি এসে গাড়ী থামালো। সুমি গাড়ী থেকে নামতেই তুফান বললো, আবার কবে দেখা হবে সুমি?

সুমি বললো, জানিনা, পরে টেলিফোনে জেনে নেবে।

সুমি ছুটে চললো হাসপাতালের ভেতরের দিকে।

রাত্রি গাড়ীর চাকার নীচে পেষ্ট হওয়া বাক্সটার দিকে ঝুকে কাঁদতে লাগলো, আমার শখের ভাপা পিঠাগুলো!

সে বাক্সটা তুলে নিতে গিয়েই সুমিকে তুফান মেইলের গাড়ী থেকে নামতে দেখে গর্জন করে উঠলো, সুমিইইইইইইইইইইইইইই!

তার সেই গর্জনটা অবশ্য মোটেও সুমির কানে আসেনি।

রাত্রি নার্স ষ্টেশনের ঐপাশের টেবিলে খুবই মনোযোগ দিয়ে কি যেনো করছে। সে হাতে হ্যাণ্ড গ্লোভস পরেছে। তারপর মেডিক্যাল ট্রে থেকে একটা সার্জিক্যাল সিজার তুলে নিতেই, রাধিকা রাত্রিকে ডাকতে ডাকতে নার্স ষ্টেশনে ঢুকছিলো।

রাধিকাকে ঢুকতে দেখেই নার্স ষ্টেশনের সবাই ঠোটে আঙুল ঠেকিয়ে শব্দ করলো, হিসসসসসসসসসস।

রাধিকা কিছুই বুঝতে পারলোনা, কি ব্যাপার? আপাততঃ সে সবার ইশারাতে চুপ করে গেলো। তারপর, সে পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে রাত্রির পেছনে এসে দাঁড়ালো। রাত্রি তুফান মেইলের গাড়ীর চাকায় পেষ্ট হওয়া বাক্সটার চারিদিক অতি সতর্কতার সাথে কেটে, ফোরসেপ দিয়ে যত্ন করে ঢাকনিটা তুলতেই পেছন থেকে রাধিকা ফিঁশ ফিঁশ করে বললো, একদম খাওয়ার অযোগ্য!

রাত্রি ঠোট বাঁকিয়ে কেঁদে ফেললো, আমার শখের ভাপা পিঠাগুলো!

পেছন থেকে রোকেয়া বললো, গুরু শিষ্যের ভাব দেখো?

ঠিক তখুনি নার্স ষ্টেশনে গিয়ে ঢুকলো সুমি। রাত্রি আর রাধিকার দিকে সবার কৌতুহলী নজর দেখে, সে এগিয়ে গেলো সেদিকে। টেবিলের উপর রাখা পেষ্ট হওয়া বাক্সটার ভেতরের দৃশ্য দেখে তার মুখ থেকে নিজের অজান্তেই বেড়িয়ে এলো, ছি! কি এগুলো? দেখে কেমন ঘিন্না লাগছে!

রাত্রি সুমির দিকে কটমট করে তাঁকালো। তারপর, ক্ষেপে এলো তার দিকে, বললো, আমার ভাপা পিঠাগুলো ফিরিয়ে দাও।

রাত্রির অগ্নিমূর্তি চেহারা দেখে সুমি দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলো। রাত্রিও তার পেছনে পেছনে দৌড়ছে। রাধিকা তাদের থামাতে চাইছে। অথচ, রাত্রি আরো ক্ষেপে ক্ষেপে তেড়ে আসছে সুমির দিকে। সুমি দৌড়তে দৌড়তে নার্স ষ্টেশন থেকে বেড়িয়ে যেতে উদ্যোগ করতেই, মিনা রায় এসে ঢুকলো। নার্স ষ্টেশনের ভেতরে তাদেরকে ছুটাছুটি করতে দেখে সে মিষ্টি হেসে বললো, যে রকম ভেবেছিলাম। মেয়ে দুটিতে মিলবে ভালো।

রাত্রি মিনা রায়কে খেয়াল করেনি। সে সুমিকে দৌড়াতে দৌড়াতে রাগের গলায় বললো, কিসের মিল?

হঠাৎ পেছন ফিরে মিনা রায়কে দেখেই, ভয়ে তার চেহারাটা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

মিনা রায়ের গলা শুনে সবাই এটেনশন হয়ে দাঁড়ালো। রাত্রি আর সুমিও সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

মিনা রায় রাত্রিকে বললো, তারপর রাত্রি, তোমার জীবনের প্রথম তদারকীর কাজ কেমন চলছে, শুনি?

রাত্রি আমতা আমতা করছে। তারপর সে ভয়ে ভয়ে বললো, হুম, ভালো।

মিনা রায় তারপর সুমিকে বললো, তোমার কেমন চলছে সুমি?

সুমি বললো, জী প্রতিদিন অনেকটা আনন্দের মাঝেই কেটে যাচ্ছে।

মিনা রায় বললো, আমিও তাই ভাবছি। তোমরা দুজনে একটা চমৎকার জুটি হবে!

রাত্রি অবাক হয়ে বললো, এই সুমির সাথে?

মিনা রায় বললো, কেনো নয়? দুজনের বয়সতো প্রায় একই, লম্বায়ও সমান সমান, স্লীম ফিগার দুজনেরই। চেহারায়ও কেমন যেনো মিল আছে তোমাদের। মাঝে মাঝে তো দু বোনের মতো লাগে তোমাদের। তোমাদের দুজনকে একসাথে দেখলে আমার চোখ জুড়িয়ে যায়। ঠিক আছে, আমি এখন আসি তাহলে। তোমরা সবাই ঠিকমতো কাজ করো কেমন?

মিনা রায় চলে যেতেই আগুনের মতো চোখ করে তাঁকালো রাত্রি সুমির দিকে। ভাবটা এমন যে, সে সুমিকে একবার দেখে নেবে। সুমিও কম যাবো কেনো? সেও আগুন হয়ে তাকালো তার দিকে।

রাত্রি, বাড়ীওয়ালার বাগান থেকে ছিড়ে আনা হলুদ রংয়ের কসমস ফুলটা, একটি গ্লাসে পানি ঢেলে তাতে সাজালো সে। সে সাজানো ফুলটা নিয়ে তিনশ এগার নম্বর কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলো। জে করিম কেমন যেনো উদাস হয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিলো। রাত্রি জে করিম সাহেবের বেডের কাছাকাছি এসে বললো, করিম সাহেব, কালকের ঘটনার জন্যে সত্যিই দুঃখিত।

জে করিম পাত্তা দিলোনা রাত্রির কথা। সে রাত্রির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, রাগী রাগী একটা চেহারা নিয়ে অন্যদিকে তাঁকিয়ে রইলো।

রাত্রি জে করিমের বেডের পাশে, টিপয়ের উপর ফুলের গ্লাসটা রেখে বললো, আবার যদি গোসল করার খুব ইচ্ছে হয় তাহলে যে কোন সময় নার্স কল দেবেন। এখন আসি।

রাত্রি বেড়িয়ে যেতেই জে করিম, টিপয়ের উপর রাখা হলুদ কসমসটার দকে তাকালো। তার মনটা আরো উদাস হয়ে গেলো। জে করিম জীবনে অনেক পয়সা কামিয়েছে, নাম ধাম করেছে, অথচ, জীবনে কখনো এত মমতা পায়নি সে। এমন কি, এই কয়দিন ধরে হাসপাতালে পরে আছে সে, তাকে এক নজর দেখার জন্যে কেউ আসেনি। জে করিম ফুলটার দিকে তাকিয়ে রইলো আনমনে।

আজ সকাল থেকেই বেশ কয়েকটা অঘটন ঘটে গেলো। প্রথমটা ঘটলো, স্যালাইন দেয়া এক রোগীকে সি টি কক্ষে নিয়ে যাবার সময়। রাত্রি স্যালাইনে রাখা রোগীটার হুইল চেয়ারটা ঠেলে ঠেলে সি টি কক্ষের দিকে নিয়ে চলছে। সুমি স্যলাইন স্ট্যাণ্ডটা ঠেলে ঠেলে অনেকটা রাত্রির উপর ঈর্ষার ভাব নিয়ে আগে ভাগে চলছিলো। রাত্রি রোগীকে সি টি কক্ষে গিয়ে কি কি করতে হবে তার একটা ব্যাখ্যা করছে চমৎকার ভাবে। হঠাৎই রাত্রি বারান্দার ত্রিমুখী মোড়ে বামে ঘুরলো। সুমি তখনো বীর দর্পে সোজা হাটছিলো। তাতে করে রোগীর হাত থেকে স্যালাইনটা ছুটে গিয়ে কল কল করে রক্ত ঝরতে লাগলো। রাত্রি সুমিকে ধমক দিয়ে বললো, তোমাকে না বললাম, বামে ঘুরতে?

সুমি বললো, কই শুনিনি তো?

রাত্রির রাগ বাড়লো খুবই। সে তার কান টেনে বললো, তা শুনবে কেনো? কানে তো তালা লাগিয়েছো দশটা।

সুমিরও রাগ বেড়ে গেলো রাত্রির উপর। সে চেচিয়ে বললো, তুমি আমার কান টানলে কেনো?

হাত থেকে কল কল করে রক্ত ঝরা রোগীটা চেচিয়ে উঠলো, ঝগরা বিবাদ পরে করো। আগে আমার কিছু একটা করো।

রাত্রি রোগীর হাতের দিকে তাকাতেই রক্ত চোখে পরলো। সে বললো, স্যরি স্যরি। এক্ষুনি ব্যবস্হা করছি।

দ্বিতীয়টা ঘটলো রোগীদের বেড সীট বদলাতে গিয়ে। সদ্য ধোয়া এক তোঁজ ধবধবে সাদা বেড সীট নিয়ে ঢুকলো, সুমি আর রাত্রি তিনশ এগার নম্বর কক্ষে। রোগীদের এক বেড থেকে অন্য বেডে সরিয়ে পালা ধরে বেড সীট বদলানোর কাজটা করছিলো দুজনে মিলে।

এই বেড সীটটা পাশে ছোট কিনা কে জানে। ওপাশে টেনে বেড সীটের পার্শ্বদেশটা বেডের নীচে ঢুকানোর উদ্যোগ করছে রাত্রি। অথচ, এই পাশে বেশ টান পরছে। এপাশেও সীটের পার্শ্বদেশ বেডের নীচে ঢুকানোর জন্যে, বেড সীটটা একটু হ্যাচকা টান দিলো সুমি। রাত্রি বেড সীটটা জোড়ে টেনে ধমকে বললো, তোমার দিকে বেশী চলে গেছে।

সুমি আবারো সজোড়ে বেড সীটটা টেনে বললো, আমার দিকে তো নাইই।

রাত্রি রেগে, বেড সীটটা এমন এক হ্যাচকা টান দিলো যে, বেড সীটটা ছিড়ে দুভাগ হয়ে গেলো।

বাবুল, বাদশা আর রতন তখনো নুতন করে আনাড়ী নার্সের পয়েন্ট গুনছিলো। তাদের এই কাণ্ড দেখে তারা চুপি চুপি আলোচনা করলো, দুজনেকেই পয়েন্ট দেয়া যায়, কি বলো?

শেষটা ছিলো সবচেয়ে সাংঘতিক। বিশাল খাবারের ট্রলীটা নিয়ে সুমি চলছিলো রোগীদের কক্ষের দিকে। সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছেনা। ওপাশ থেকে রোগীদের ব্লাড টেষ্টের জন্যে সংগ্রহ করা ব্লাড টিউবে ভর্তি ট্রলীটা ঠেলে ঠেলে এগিয়ে আসছিলো রাত্রি। সে অনেকটা আনমনে চলছিলো সুমিকে বকাবকি করতে করতে। হঠাৎ একটা টুং টাং কাঁচ ভাঙা শব্দে অবাক হলো সুমি। মেঝের দিকে চোখ পরতেই সে লক্ষ্য করলো, ভাঙা ব্লাড টিউব থেকে রক্ত গড়িয়ে যাচ্ছে মেঝেতে। সে বিশাল খাবারের ট্রলীটার অপর পাশে ভয়ে ভয়ে চুপি দিলো। রাত্রিকে দেখে তার গলা শুকিয়ে গেলো। সে খাবারের ট্রলীটার আড়ালে লুকোনোর চেষ্টা করলো।

রাত্রি গর্জন করে উঠলো, সুমিইইইইইইইইইইই!

রাত্রি সুমির হাত টেনে ছুটতে ছুটতে চললো, নার্স ষ্টেশনের দিকে।

রাধিকা দুজনের উপরই রাগ করলো প্রচণ্ড। সে ধমকে ধমকে বললো, কি শুরু করলে তোমরা একটার পর একটা অঘটন!

সাকীব একটা জরুরী ব্যাপারে নার্স ষ্টেশনে এসে ঢুকলো। সে বললো, সিস্টার রাধিকা, তিনশ পাঁচ নম্বর কক্ষের?

সাকীবের কথা শেষ না হতেই রাধিকা চেচিয়ে বললো, এখন ব্যাস্ত।

তারপর, রাত্রি আর সুমির দিকে চোখ লাল করে বললো, ব্লাড টিউব ভেঙে ফেলেছো? তার পরিনাম কি জানো? আবার যে সবার ব্লাড সংগ্রহ করতে হবে বুঝতে পারছো কিছু?

রাধিকাকে উত্তেজিত দেখে সাকীব অনেকটা থতমত খেয়ে গেলো। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

সুমি বললো, আমার কোন দোষ নেই। সিস্টার রাত্রি ইচ্ছাকৃত ভাবে আমার ট্রলীতে ধাক্কা লাগিয়েছে।

সুমির কথায় রাত্রি ভীষণ রেগে বললো, এই কথা বলতে পারলে তুমি? তুমি কি জানো? তোমার জন্যে কি পরিমান যন্ত্রনা সহ্য করতে হচ্ছে আমার?

হৈ চৈ শুনে মিনা রায়ও এসে ঢুকলো নার্স ষ্টেশনে। সে সুমির দিকে তাঁকিয়ে বললো, সুমি, তুমি তোমার কাজে যাও।

সুমি অন্যত্র চলে যেতেই মিনা রায় রাত্রিকে বললো, রাত্রি, সুমিকে কেনো চলে যেতে বললাম, বুঝতে পারছো?

রাত্রি খানিকটা উত্তেজিত ভাবে বললো, আমি সুমির তদারককারী, এই জন্যেই তো, না?

মিনা রায় বললো, ঠিক।

রাত্রি আরো উত্তেজিত হয়ে বললো, তদারককারী! তদারককারী! বাহবা, সবসময় শুধু একটা কথা বলে আমাকে শাসন করে সবাই। আমি আমার আপ্রান চেষ্টা করছি। অথচ, সুমি আমার কোন কথাই শুনেনা। আমি কি করবো?

রাধিকা বললো, রাত্রি, থামো। মুখে মুখে কথা বলতে হয়না।

লতিফা এগিয়ে এসে বললো, ম্যাডাম, তদারককারী হিসেবে রাত্রি এখনো অযোগ্য।

লতিফা রাধিকার দিকে আড় চোখে তাঁকিয়ে বললো, আমি যদি নার্স সুপারভাইজার হতাম, তাহলে সুমির তদারককারীর ব্যাপারটা পুর্নবিবেচনা করতাম।

সাকীব লতিফার দিকে খুব কর্কশ চোখে তাঁকালো। রাধিকা মাথা নীচু করে রইলো।

লতিফা আরো যোগ করলো, আমি কি দায়ীত্বশীল কাউকে খোঁজে দেখবো, ম্যাডাম?

মিনা রায় বললো, আমাকে একটু ভাবতে দাও।

রাত্রি আগুন হয়ে বললো, তাই যেনো করা হয়। আমার জন্যে খুবই ভালো। স্যরি।

এই বলে রাত্রি ছুটে পালালো নার্স ষ্টেশন থেকে। রাধিকা পেছনে পেছনে ছুটলো, ডাকলো, রাত্রি কোথায় যাচ্ছো দাঁড়াও।

সুমি অনেকটা অন্যমনস্কভাবে বারান্দা ধরে হাঁটছিলো। ঐপাশ থেকে আহমেদ আসছিলো। সে সুমিকে দেখেই থামলো, বললো, আবার নাকি কি ভেঙেছো শুনলাম?

সুমি গম্ভীর হয়ে বললো, ডাঃ আহমেদ, আমি চাকরীটা ছেড়ে দেবো।

আহমেদ অবাক হয়ে বললো, চাকরী ছাড়বে কেনো, সবে তো ঢুকলে মাত্র! কারন কি?

সুমি বললো, কারন হলো রাত্রি। কোন একটা ভুল হলেই সব দোষ আমার ঘড়ে চাপিয়ে দেয়। আমাকে বকাবকি করে। বিচার জমায়। কি স্বার্থপর মেয়েরে বাবা!

সুমি এই বলেই পথ চলতে শুরু করলো। আহমেদ সুমির কথা শুনে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

রাত্রি এদিকেই আসছিলো। রাত্রিকে দেখে আহমেদ অনেকটা অভিমানে, ঘুরে বিপরীত দিকে হাঁটতে লাগলো। পেছন থেকে রাত্রি ডাকলো, আহমেদ?

আহমেদ না শুনার ভান করে হাঁটতে লাগলো।

রাত্রি বললো, একটু শোন, আহমেদ!

আহমেদ থামলো, বললো, কি আর বলবে, সব শুনেছি।

রাত্রি অবাক হয়ে বললো, কি শুনেছো?

আহমেদ বললো, সুমি সব বলেছে, তুমি আবার তার উপর রাগারাগি করেছো। সে খুব মন খারাপ করে আছে। তদারককারী হয়েছো, তাই বলে নবাগতা একটা মেয়েকে এত শাসন করা ঠিক না।

রাত্রি উত্তেজিত হয়ে উঠলো, আহমেদ, তুমিও এই কথা বললে। ঠিক আছে, তোমার অবগতির জন্যে বলছি, সুমির তদারককারীর যেই দায়ীত্বটা এতদিন আমার উপর ছিলো, তা এই মুহূর্তে ইস্তফা দিয়ে এসেছি। আর সুমির উপর যদি এতই মায়া আর দরদ থাকে তোমার, তাহলে তার তদারককারীর দায়ীত্বটা তুমি নিচ্ছো না কেনো?

আহমেদ বললো, মানে?

রাত্রি বললো, মানে আবার কি? নবাগতা নার্স, নবাগত ইন্টার্নী ডাক্তার, ভালোই তো মিলবে।

আহমেদ বললো, বাচ্চা মেয়েদের মতো কথা বলছো কেনো?

রাত্রি বললো, হ্যা হ্যা, আমি বাচ্চা মেয়ে, আমি আনাড়ী, আমি বোকা। চার বছর ধরে নার্সের কাজ করে, সেরা আনড়ী নার্সের উপাধি পেয়েছি। আর কিছু বলবে?

আহমেদের মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেলো রাত্রির কথা শুনে। সে বললো, তোমার যা খুশী তাই করো।

আহমেদ তার নিজের কাজে চললো।

রাত্রি জোড়ে জোড়ে বললো, হ্যা হ্যা, এখন থেকে আমার খুশী মতোই করবো। দেখি কে কি বলে।

রাত্রি হু হু করে কাঁদতে লাগলো।

চলবে